



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 785 - 792

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

রাঢ় বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সমন্বয় ও সম্প্রীতির লোকদেবতারূপে খজখেজের, বদর পির ও মানিক পির

মুন্সী মহঃ সাহেবুর রহিম

গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: mmsrrahim@gmail.com

 0009-0009-0784-9297

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Sufi, Pir, Hajat,
Shirni, Shariat,
Gazi, Dayasi,
Dargah.

Abstract

Primitive human societies were primarily dependent on hunting and animal husbandry, and their consciousness was deeply shaped by fear of natural forces. Confronted with storms, disasters, and other uncontrollable phenomena, early humans felt helpless and sought protection by imagining powers greater than themselves. Over time, various superstitions, rituals, and practices aimed at appeasing nature became integral to daily life, leading to the emergence of folk deities.

With the arrival of Muslims in the region, a syncretic culture began to evolve through the interaction between Islamic traditions and Hindu social customs. While Hindu society was characterized by Brahmanical dominance and rigid social stratification, the Sufi pirs emphasized equality, fraternity, and spiritual devotion. These ideas significantly influenced Hindu society, just as Hindu cultural practices influenced Muslim rulers. This mutual interaction fostered a tradition of coexistence and cultural harmony. As a result, folk pirs and folk deities gradually became comparable in their roles and significance. In many parts of Rarh Bengal, sacred spaces such as thans, mazars, and astanas developed around these figures. These sites became shared spaces of devotion where people from both Hindu and Muslim communities participated freely. During Hindu festivals, Muslims often observed vows and rituals, while Hindus similarly engaged in manat practices and supported Muslim religious activities.

Folk figures such as Khajkhejer, Badar Pir, and Manik Pir exemplify this religious syncretism. Their myths and significance vary across regions. Through fieldwork and local studies, this research examines Badar Pir and Manik Pir as symbolic representations of Hindu-Muslim folk religiosity. The shrines dedicated to these figures function as spaces where distinctions of religion and caste dissolve, fostering communal harmony. The rituals, worship practices, and fairs associated with these folk deities have played a crucial role in strengthening bonds of mutual respect and coexistence between Hindu and Muslim communities in Rarh Bengal.

Discussion

লোকসমাজে যে সকল দেব-দেবীরা পূজিত হন তারাই লৌকিক দেবদেবী নামে পরিচিত। এই লোকসমাজ গ্রামে বসবাস করে তাই এই দেবদেবীদের ‘গ্রাম্য দেবদেবী’ও বলা হয়ে থাকে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে দেব-দেবীদের প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় বৈদিক দেবদেবী, পৌরাণিক দেবদেবী, লৌকিক দেবদেবী।^১ শাস্ত্রীয় দেবতাদের চেয়ে লৌকিক দেবতারা বহুপ্রাচীন।^২ এ প্রসঙ্গে মিহির চৌধুরী কামিল্যা বলেন –

“লৌকিক দেবতারা আরও প্রাচীন, সভ্যসমাজ বা বেদ-পুরাণের দেবতাদের থেকেও তারা অনেক পুরানো।”^৩

এই দেবদেবীদের মন্ত্রযুক্ত উপাচারের শাস্ত্রীয় কোন বিধান নেই। এরা মূলত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় থেকে আলাদা। বাংলায় যারা মূল বা আদিম অথচ অন্ত্যজ বলে পরিচিত সেই সম্প্রদায়ই লোকদেবতার প্রধান পূজারী বা ‘দেয়াসী’। কিছু কিছু ক্ষেত্রে লোকদেবতায় ব্রাহ্মণ্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।^৪ রাঢ় বাংলায় লৌকিক দেবদেবীরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে মানুষের দ্বারা পূজা পাচ্ছেন, যাদের নাম শাস্ত্রে বা ইতিহাসে উল্লেখ নেই। গ্রামের পাশাপাশি শহরের মানুষও বংশ-পরম্পরায় পূজা অর্চনা করে চলেছে। তাঁদের বৈশিষ্ট্যগুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই দেব-দেবীগণের মধ্যে কেউ সাধারণভাবে সকল হিন্দু কর্তৃক পূজিত। আবার কেউ কেউ পূজিত হন বিশেষ বিশেষ বৃত্তি ও পেশাজীবীদের দ্বারা যেমন মৎস্যজীবীদের পূজ্য মাকাল ঠাকুর। কেউ পূজিত হন শুধু মেয়েদের দ্বারা যেমন ভাদু ও টুসু দেবী। কেউ কেউ শুধু উপজাতিদের দ্বারা যেমন – ভৈরব। আবার কেউ কেউ পূজিত হন হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী দ্বারা যেমন ওলাইচণ্ডী, মনসা, বড়খাঁ গাজী, পির গোরাচাঁদ, সত্যপির, বনবিবি, বদর পির, মানিক পির, খজখজের প্রভৃতি। পূজারীর বিভিন্ন ইচ্ছাপূরণের জন্য তারা পূজা পেয়ে আসছেন। ইচ্ছাগুলোর মধ্যে আছে অধিক মৎস্য পাওয়ার ইচ্ছা, বনে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচা, বাঘের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করা, শিশুদের মঙ্গল ও রোগ থেকে মুক্তি, গ্রামরক্ষা, পশুদের রোগমুক্তি, চর্মরোগ থেকে মুক্তি, কলেরা রোগ থেকে মুক্তি ও সন্তানলাভের ইচ্ছা ইত্যাদি। লৌকিক দেব-দেবীর মধ্যে এদের কারও কারও প্রতিমা আছে, কারও কারও প্রতিমা নেই যেমন মাকালঠাকুর, হাড়িঝি ও করম পূজা। কোনো কোনো দেব-দেবীর প্রতীক বৃক্ষ, প্রস্তর খণ্ড অথবা মাটির স্তূপ। কোনো কোনো দেব-দেবীর প্রতিমার রূপ উগ্র যেমন – পাঁচুঠাকুর, আবার কোনো কোনো দেব-দেবীর প্রতিমা সৌম্য, শান্ত ও সুশ্রী। এইসব আঞ্চলিক হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে পরবর্তীকালে মুসলমান পির বা বিবিমাদের সংমিশ্রণ ঘটেছে। সুফি পিরদের অলৌকিকতা, কর্মমুখীতার ফলে বাঙালির লৌকিক সমাজে এক ধরনের ধর্মীয় রূপান্তর ঘটে।

বাংলায় সুফিবাদের পরিণতি হল পিরবাদ, পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্মে স্থবির, হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী গুরুশিষ্য ও মুসলমানদের পির মুরিদ এর ধারণা একই। সুফি সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এক যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেছিল।^৫ ভারতে তথা বাংলায় এসে লোকায়ত বিশ্বাসের সাথে মূল ইসলামের সংমিশ্রণের ফলে ইসলাম ধর্মে নানা ধরনের নতুন নতুন বিশ্বাস ও প্রথার উদ্ভব হয়, গ্রামবাংলার লৌকিক জীবনের সঙ্গে জড়িত পিররা ‘লৌকিক পির’ এবং তাদের প্রচলিত লৌকিক মতবাদ ‘পিরবাদ’ নামে পরিচিতি পাই। পিরের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের মতো। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস পিরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারলেই সহজে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এ সমস্ত বিশ্বাস ও প্রথা মূল ইসলামের, বিশেষত শরিয়তের পরিপন্থী বা সাংঘর্ষিক। এই সকল পিরদের সম্পর্কে জানতে গেলে ক্ষেত্রসমীক্ষার উপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়া আমরা প্রাচীন পুঁথি, পাঁচালী, লোকগান, লোকগাথা প্রভৃতি লোকসাহিত্য থেকে জানতে পারি। লৌকিক পির প্রথম দিকে মুসলমানদের নিকট থেকে শ্রদ্ধা ও শিরনি পেলেও কালক্রমে হিন্দুদের কাছ থেকেও শিরনি পেতে থাকে। শুরুর দিকে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এবং ক্রমশ অভিজাত সমাজ পর্যন্ত এসব পিরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভক্তি করতে লাগলো। মূলত পিরদের নানা বুজরুকি বা অলৌকিক ক্ষমতা ও সেসব নিয়ে প্রচলিত গল্পকথা এই আকর্ষণ তৈরীর প্রধান কারণ। বাংলার লোকসমাজে অনেক পির ও লৌকিক দেবদেবী রয়েছে। হিন্দু ধর্মে যেমন লৌকিক দেবদেবী হিসাবে দক্ষিণরায়, বনদুর্গা, পাঁচ কুমার, বাসলী, পাঁচুঠাকুর, ওলাইচণ্ডী, শীতলা, ঢেলাইচণ্ডী প্রভৃতি এখনো পূজা পাচ্ছেন, তেমনি মুসলমান সমাজে সত্যপির, কালু গাজী, মাদারপির, পাঁচপির, জংলিপির, বদরপির, মানিকপির,

পিরগোরাচাঁদ, খজখেজের, খোকাপির, বুড়াপির প্রভৃতি পিরগণ শিরনি ও শ্রদ্ধা পেয়ে আসছেন। এ সমস্ত পিরগণের কেউ কেউ ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে স্বীকৃত, আবার অনেকের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এইসব পির সুফিগণ দেহত্যাগ করলে তাদের কবরস্থানে মাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব মাজারে ভক্তগণ নানা মনস্কামনা নিয়ে আসতে থাকে। আজও তারা পির হিসেবে লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রদ্ধা ও শিরনি পেয়ে আসছেন। ঐতিহাসিক ও গাজীপির ছাড়াও ফাতেমা বিবি, বনবিবি, ওলাবিবির মত বিবিরা আজও বাংলায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক পূজা ও হাজত পেয়ে থাকেন। এই সমস্ত পিরের উত্থানের পিছনে বিভিন্ন কাহিনী রয়েছে। তার সবকিছুর ঐতিহাসিক ভিত্তি না থাকলেও বাংলার লোক ইতিহাসে লোক কাহিনীগুলোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নব্য ধর্মান্তরিত শ্রেণী পুরোনো সংস্কারবশত লৌকিক দেবদেবীর পূজা ছাড়তে পারেননি। ফলে পির ফকিররাও বাধ্য হয়েছিলেন এইসব লৌকিক দেবদেবীর সাথে আপোস করতে। সাধারণত বাংলার অনেক লোকাচারের মতোই লৌকিক দেবদেবীর পূজোর সাথে জড়িত থাকা লোকাচারগুলোও বিলুপ্তির মুখে মনে হয়। কেনই বা ক্ষীর রান্না করা হবে, কেনই বা কেউ বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল সংগ্রহ করবেন এসব নিয়েও আজকাল আর বিশেষ কেউ মাথা ঘামান না। তা সত্ত্বেও লোকের অজান্তেই প্রতিবছর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে দেবদেবীর পিরের পূজোর বা হাজতের প্রশ্নে ঘটে চলেছে এক অদ্ভুত মিলনোৎসব। সে উৎসবে ব্রাহ্মণত্বের অহংকার নেই, জাত্যাভিমান নেই, বিদ্বেষ নেই। আছে শুধু সরল বিশ্বাস ও ভক্তি। ‘বারো মাসে তের পার্বণ’ প্রবাদ দ্বারা উৎসবমুখর বাঙালি জাতির মৌলিক পরিচয় ফুটে ওঠে। হিন্দুদের ব্রত আচার অনুষ্ঠানের আধিক্যের কথা বিবেচনা করেই এরূপ প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে। বার, তিথি, মাস ও ঋতুভিত্তিক এসব পার্বণের উদ্ভবের পেছনে প্রাকৃতিক ও দৈব শক্তির কল্পনা আছে। শাস্ত্রীয় ধর্মের পাশাপাশি হিন্দুরা লক্ষ্মী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, ওলাদেবী, বনদুর্গা, দক্ষিণরায়, সত্যনারায়ণ, পাঁচু ঠাকুর প্রভৃতি লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর পূজা ও আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। দীর্ঘকাল একত্র বসবাসের ফলে নিম্নশ্রেণির মুসলমানদের ওপরেও এসবের প্রভাব পড়েছে। তারা সত্যপির, গাজীপির, মানিকপির, মাদারপির, খজখেজের বা খোয়াজখিজির, ঘোড়াপির, বনবিবি, ওলাবিবি, হাওয়া বিবি প্রভৃতি কাল্পনিক, লৌকিক ও ঐতিহাসিক পির পিরানিদেরকে হিন্দু দেবদেবীর প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করিয়ে পূজা মানত করে থাকে। এসবের পেছনে অসহায় মানুষের রোগব্যাদি ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার কামনা বাসনা নিহিত রয়েছে। দুই সম্প্রদায়ের কেউ কেউ পূজো ও মানত পৃথকভাবে করে, আবার কেউ কেউ উভয়ে পরস্পরের অংশীদার হয়। সত্যনারায়ণ ও সত্যপির, বনদুর্গা ও বনবিবি যে একই ভাবনার ভিন্ন রূপ তাতে সন্দেহ নেই। এই সকল লোকদেবতার মধ্যে খজখেজের, মানিক পির ও বদর পিরের সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

আঞ্চলিক লোকদেবতা খজখেজের : বাংলার বিশিষ্ট লৌকিকদেবতা খোজাখাজের অথবা খোয়াজখিজির, সংক্ষেপে খজখেজের বলা হয়। খজখেজের আল্লাহের অলি বা পির। খোয়াজ কথার অর্থ অধিকর্তা।^১ আল্লাহর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি মালিকের (আল্লাহর) কাছ থেকে জলসম্পদের অধিকর্তারূপে মানুষের শ্রদ্ধা পাওয়ার আশীর্বাদ লাভ করেন। পৃথিবীতে যত পানি আছে তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার বা মালিকানা আল্লাহ খজখেজেরকে দান করেছেন। যারা নদী সমুদ্রে মাছ ধরতে যান, তাঁরা খজখেজেরের নাম স্মরণ করে নৌকা বা লঞ্চ ছাড়েন এবং নানান ধরনের আচার আচরণ পালন করেন। যারা ভক্তি ভরে ডাক দেয় তাদেরকে তিনি সরাসরি দেখা দেন এবং বিপদ থেকে রক্ষা করেন। মুসলিম দুনিয়ায় খোয়াজখিজির একটি পৌরাণিক চরিত্র। সকলের মতে, ইহুদিদের এলিজা ও মুসলমানদের ইলিয়াস নবি পরবর্তীকালে রূপক চরিত্র খোয়াজখিজিরে পরিণত হন। সুফি সাধক ইব্রাহিম ইবন অদহম খোয়াজখিজিরের অলৌকিকত্ব প্রচার করেন। তাঁর শিষ্যগণ ভারতে মুঘল আমলে খিজিরিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়।^২

পৌরাণিক দেবতার মধ্যে বিষ্ণু সমগ্র জল-সম্পদের দেবতা, এরূপ লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। বরুণদেব বিষ্ণুদেবতার নিকট হতে জলভাগের প্রভু রূপে মান্যতা পাওয়ার অধিকার লাভ করেছেন। এছাড়া বৃষ্টিদেবতা রূপেও বরুণদেবের নাম উল্লেখ আছে। খোয়াজখিজির আমাদের দেশে ত্রয়োদশ শতকে তুর্কিদের হাত ধরে উত্তর ভারত থেকে বঙ্গে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে বৈদিক জল দেবতা বরুণের স্থান লাভ করে। এ প্রসঙ্গে ড. এনামুল হক A History of Sufism in Bengal গ্রন্থে লেখেন –

“Probably, Up to the fourteenth century he (Khidr) was not attributed with all the identical qualities of Varuna, the Vedic Hindu god of waters. Besides, the Hindus believe in the sanctity of many rivers of India and in the deities presiding over them. This belief had undoubtedly contributed something to the conversion of Arabian Khidr into Varuna of the Indians. This is why we mark Khidr in the subsequent centuries as one divested of almost all Islamic rather Arabian associations to become an excellent counterpart of Varuna or any of the water deities of India.”⁷

সুতরাং খজখিজের দেবতা-কল্লনায় ও নামকরণের নেপথ্যে বিষ্ণু বা বরুণ নামক পৌরাণিক দেবতার ইসলামিকরণের ঘটনা আছে বলে অনুমান করা হয়।^৮ ঢাকার মুঘল সুবেদার মুকরম খান (১৬২৬) খোয়াজ খিজিরের উদ্দেশ্যে ‘বেরা’ উৎসব পালন করেন। পরে মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ (১৭০৪-১৭২৫ খ্রি.) খোজাখিজির জলদেবতার সম্ভৃতি বিধানের জন্য জাঁকজমকের সঙ্গে ‘বেরা’ উৎসবের সূচনা করেন।^৯ প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার এই উৎসব পালন করা হয়।^{১০} এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ গঙ্গা নদীতে ভেলা ভাসানো। ভেলায় অসংখ্য প্রদীপ ও মোমবাতি জ্বালানো ও সারারাত আতসবাজি পোড়ানো হয়।^{১১} বাঁশ ও কলাগাছ দিয়ে এই ভেলা সুসজ্জিত করে বানানো হয়। ভেলার উপরে রঙিন কাগজ দিয়ে নানা ধরণের মিনার, গম্বুজ ও মসজিদ বানানো হয়। নানা ধরণের প্রদীপের আলো, মোমবাতির আলো, গ্যাস ও কেরোসিনের আলো দিয়ে বেরার ভেলাটি সাজানো হয়। এছাড়া সামনে মকরমুখ বা পিছনে হাতির মুখ যুক্ত চারটি ময়ূরপঙ্খী তৈরি করে নবাব বাড়ি থেকে বাজনাসহ মিছিল করে তোপখানার ঘাটে আনা হয়। এরপর খোজাখিজিরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সুজির পায়ের, রুটির শিরনি, প্রদীপ ইত্যাদি রেখে তোপখানা থেকে তোপ দেগে ভেলা ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ভেলা ভাসানো ছাড়া এদিনে অসংখ্য মানুষ কলার প্লেটের উপর কাগজের ঘেড়াটোপে মোমবাতি জ্বালিয়ে ভাগীরথীর বুকে আলোর কমল ভাসায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই কমল ভাসানোর সঙ্গে বাঙালি হিন্দু মেয়েদের পৌষ সংক্রান্তি দিন সোদোব্রত করে সোদো ভাসানোর মিল রয়েছে।^{১২} বেরা উৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায় নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদ কাহিনী (১৯৭৮) গ্রন্থে, এ মিত্রের District Handbook : Murshidabad (১৯৫১) ও কলকাতার সমাচার দর্পণ (৯ অক্টোবর ১৮১৯ এবং ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮২১)^{১৩} পত্রিকার প্রতিবেদনে। কথিত আছে মুর্শিদকুলি খাঁর সময় এই উৎসবের খুব জাঁকজমক ছিল এবং ভেলা গড়া হত লম্বায় তিনশো হাত ও চওড়ায় একশো পঞ্চাশ হাত। বর্তমানে এই মাপের ভেলার পরিবর্তে ত্রিশ হাত লম্বা ও কুড়ি হাত চওড়া ভেলা তৈরি করা হয়। জলপথে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য জলদেবতা খোজাখিজিরের সম্ভৃতি বিধানের জন্য এই উৎসবের সূচনা বলে জানা যায়। আজও পির খোজাখিজিরের উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদে ভাগীরথী নদীর পূর্বতীর ঘেঁসে নির্মিত হাজারদুয়ারী এবং ইমামবাড়া সংলগ্ন এলাকায় ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে বেরা ভাসানো উৎসব ও মেলা হয়। Murshidabad district gazetteer এ এই বেরা উৎসবের উল্লেখ রয়েছে-

“Their construction is very simple, for a piece of plantain or bamboo bears a sweetmeat or two and the lamp. The festival is celebrated with much magnificence on the last Thursday of the month of Bhadra (September). A raft is constructed of plantain trees and bamboos and covered with earth.”^{১৪}

অন্যান্য লোক উৎসবের মতোই এই উৎসবে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রতি বছর এই উৎসবে সামিল হয় এবং এর মাধ্যমে লোকমানসের অসাম্প্রদায়িক দিকটির পরিচয় মেলে।

বর্তমান জেলার মঙ্গলকোটের বক্সিনগর, কৈচর, দাঁইহাট, গাঙ্গুলীডাঙ্গা, শ্রীখন্ড প্রভৃতি স্থানে বেরা উৎসব ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার পালন করা হয়।^{১৫}

লোকদেবতা মানিক পির : বাংলার বিশিষ্ট লোকদেবতা মানিকপির। ইনি গো-রক্ষক দেবতারূপে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে পূজিত হন। ড. সুকুমার সেন মানিকপির সম্পর্কে জানিয়েছেন এই পিরের নাম মানিকী। ইনি ইরানের লোক ছিলেন। তিনি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে জরাথুস্ত্রীয় ও খ্রিস্টধর্মের সংমিশ্রণে এক নতুন ধর্মমত গড়ে তোলেন।^{১৬} মানিকপিরের

ভাই এর নাম গজপির বা হরজিন্দা। দুজনে একসঙ্গে গ্রামের কৃষক পরিবারে ঘোরাফেরা করে গো-সম্পদ রক্ষা ও লক্ষ্মীর পাঁচালি গেয়ে বেড়াতেন। যারা গজ ও মানিককে সম্মান জানায় তাদের মঙ্গল হয় এবং কুষ্ঠ ব্যাধি - সর্পদংশন ইত্যাদি বিপদ থেকে রক্ষা পায়। মানিকপির সম্পর্কিত এইরূপ বিশ্বাস মানিকপিরের পালাগানে প্রচারিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান পিরুলি গায়ক মানিকপিরের পালাগান করেন আবার কৃষকের গোয়ালে ঘুরে একশ্রেণির মুসলমান ফকিরবেশে মানিকপিরের পালাগান করেন। সে কারণে মানিকপিরের পালাকে ‘গইলে গান’ বলে। গইলে গানের ফকির বর্তমানে গ্রামের পথে আর দেখা যায় না। বিংশ শতকের সাতের দশক অবধি এদের শিঙা বাজিয়ে চামর হাতে, ফকির বেশে পথে পথে গান গাইতে দেখা যেত। ঘরে ডাকলে তবে গোয়ালঘরে গিয়ে গান গাইতেন। মানিক পিরের গানে আছে -

“মানিক পির শাহাপির বন্দো দুই ভাই।
মরিয়া গোষ্ঠের গাভী দিয়াছে জিয়াই।”^{১৮}

গোয়ালঘরে মানিক পিরের গান গাওয়ার বিশেষ তাৎপর্য আছে। হিন্দুরা গোরুকে দেবী ভগবতী ভাবেন। লোকবিশ্বাস দেবী গাভীরূপে গোয়ালে থাকেন। তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য গোয়ালপূজা, গান, ক্ষীর রান্না, শিরনি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। গাভীর বাছুর হলে মানিকপির ও ভগবতীর নামে গোয়ালঘরে শিরনি, ক্ষীর রান্না সহ বিভিন্ন সংস্কার পালিত হয় অথবা মানিকপিরের থানে গাভীর প্রথম দুধ দেওয়া হয়। মানিকপিরের পূজাচার ও লোকবিশ্বাসের সঙ্গে শিব ও ধর্মঠাকুরের মধ্যে গভীর সম্পর্ক আছে। যেমন - শিব, ধর্মঠাকুর ও মানিক পিরের গায়ের রং সাদা, প্রতীক পশু ঘাঁড়, অনুচর যথাক্রমে - হনুমান, দক্ষ ও গজপির, আঙ্গুরবহ পক্ষী-উলুক ও হংস। ধর্ম ও মানিকপিরের পূজা-হাজত শুক্লপক্ষে অথবা জাতপূর্ণিমা বা পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া শিব, ধর্মঠাকুর ও মানিকপিরের কৃপায় কুষ্ঠ-ব্যাধি ভালো হয়। এছাড়া চক্ষুরোগ, চর্মরোগ, গো-সম্পদ রক্ষা, সন্তান-হীনার সন্তান লাভ হয়। এককথায় মানিকপির হলো পৌরাণিক দেবতা শিব ও ধর্মঠাকুরের সমাজবিবর্তিত রূপ।^{১৯}

রাঢ় বাংলার অধিকাংশ গ্রামে মানিকপিরের থান আছে। যেমন পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার আমডাঙার মানিক পির। আমডাঙা, ঘোড়ানাশ, মুস্কুলি, পাঁচবেড়িয়া, একডালা প্রভৃতি গ্রামের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মানিক পিরতলায় পূজো দেয়। গাই বিয়ালে প্রথম দুধ পিরের থানে দিয়ে আসেন এবং রোগ-ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় মানত করেন। মানিকপিরের থানে যেমন গো-সম্পদ রক্ষার জন্য পূজা দেওয়া হয় তেমনি ঢিল বেঁধে সন্তানহীনা সন্তান কামনায় মানত করেন। এছাড়া চক্ষুরোগ, নারীর সূতিকা রোগ, পায়ে কাঁটা ফোটা, চর্মরোগ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত মানিকপিরের পূজা-হাজত দেওয়া হয়। পূজার উপকরণ হিসেবে সন্দেশ, বাতাসা, ক্ষীর, ফলমূল ইত্যাদি দেওয়া হয়। অনেক ভক্ত ধূপবাতি জ্বেলেও পূজার্চনা করেন। মনস্কামনা পূরণ হলে মানতকারী মানিক পিরের নামে বাজনা নিয়ে থানে আসেন। বাংলার গ্রামে গ্রামে ফকিরদের গলায় গো-সম্পদ মঙ্গলের জন্য মানিক পিরের গান শোনা যায়। ড. গিরীন্দ্রনাথ দাসের বাংলা পীর সাহিত্যের কথা গ্রন্থে এরকমই একটি মঙ্গলগীতের উল্লেখ পাওয়া যায় -

“কথায় বলে গাই গরুর মুখে দুগ্ধ রয়, /বেশী কইরে খাইলে গাই বেশী দুগ্ধ দেয়। /চূর্ণি ভূষি খইল-
বিচালি ভেলীগুড় আর, /কাঁচা ঘাসে গাইয়ের পেটাই কয়ে দিলাম সার। /লাউ কলাই ফ্যানে ভাতে দুগ্ধ
বৃদ্ধি হয়, / দুগ্ধ বাড়ে বাছুর সারে শুনেন মহাশয়। / শীতেতে পরাবেন জামা ছেঁড়া চট দিয়া, /গরমেতে
চান করাবেন পুকুরেতে নিয়া। /স্বাস্থ্য-আলা ঘাঁড় অথবা নকল পালের বীজে /গোধনের বৃদ্ধি হবে ভাই
কয়ে দিলাম ও যে। /যেমন তেমন দুই ভাই আর দুই গাই যদি থাকে, / সংসারেতে চিন্তা নাহি কহি যে
সবাকৈ। /গরুর সেবায় তুষ্ট হয়েন আপনি ভগবান, /যাঁর কৃপায় ছোট কালে বাঁচে বাচ্চার প্রাণ। /পুরাণ-
মহাভারতেতে জানি গোধন বড় কয়, /এই ধনে যত্ন নিলে পরমাই বৃদ্ধি হয়। /কথায় বলে দুগ্ধ যদি
থাকে আগে পাছে, /কিবা ফল করে ভাই শাকে আর মাছে। /মেঠাই বল মন্ডা বল দুগ্ধ ছাড়া নয়,/
দুধ-ঘিতে শক্তি বাড়ে ব্যামো দূর হয়।/মানিক পীরের চরণ বন্দি পালা শেষ করি।/ মুসলমানে আমিন
বলেন, হিন্দুরা বলেন হরি।”^{২০}

হুগলি জেলার উত্তরপাড়া ভদ্রকালী নামক স্থানেও মানিকপিরের থান আছে।^{২১}

লোকদেবতা বদরপির : বাংলার বিশিষ্ট লৌকিকদেবতা বদরপির। অতীতে মাঝিমাঝা, জেলে প্রমুখ যারা নদী ও সমুদ্রপথে জীবন জীবিকার সন্ধানে যাতায়াত করেন তারা ‘দরিয়ার পাঁচপির’-এর নাম স্মরণ করে নৌকা জলে ভাসান এবং দরিয়ার বিপদ থেকে রক্ষা পেতে চান। দরিয়ার পাঁচপিরের মধ্যে বদর একজন। পাঁচপির হলেন আলি, কালু, গাজী, একদালা ও বদর। এইসব নামের মধ্যে পার্থক্যও আছে। জলপথে নৌকা ঝড়ঝঞ্ঝায় বিপদগ্রস্ত হলে - মাঝিগণ ‘দরিয়ার পাঁচপির বদর বদর’ বলে ধ্বনি দেন। বদর পির নানা নামে পরিচিত যেমন বদর শাহ, পির বদর, শাহ বদর, বদর প্রভৃতি। বদর পিরের পুরো নাম মখদুম শাহ বদরুদ্দিন আলম যাহিদী।^{২২} ড. এনামুল হক মোটামুটি একটা নাম নির্দিষ্ট করেছেন ‘শাহ বদর উদ্দিন আল্লামা’। ওয়াকিল আহমেদ এর “বাংলার পীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি” গ্রন্থে নদী বা সমুদ্র যাত্রাকালে মাঝি মোল্লাদের বদর পিরের উদ্দেশ্য একটি প্রার্থনার উল্লেখ পাওয়া যায়-

“আমরা আছি গোলাপাইন,

গাজি গঙ্গা নিগাবান।

শিরে গঙ্গা দরিয়া, পাঁচ পীর, বদর বদর!!”^{২৩}

বদরপিরের স্বরূপ উদঘাটনে উল্লেখিত ধ্বনি দুটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ‘গাজি’ শব্দের সাধারণ অর্থ- যাঁরা ইসলাম ধর্মের প্রচার বা রক্ষার্থে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন। ‘বাজপির’ শব্দের অর্থ বজ্রপির বা বৌদ্ধ মহাযানি। ‘বদর’ প্রকৃত অর্থে ‘বজ্র’ শব্দের ধ্বনি পরিবর্তিত রূপ। ‘বজ্র’ হলেন মহাযানি বৌদ্ধদের ইস্টদেবতা। যাঁকে মহাযানি বৌদ্ধগণ আদিদেব বা শূন্যদেবতা বলেন। আবার চন্দ্রের আর এক নাম ‘বদর’। এদেশীয় মুসলমানগণ চাঁদকে দিকনির্দেশক বা দিক নিয়ামক শক্তি বা প্রতীক বলে মনে করেন। সেই কারণে মুসলিম সমাজে যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের পূর্বে চাঁদকে বিশেষ মান্যতা দেওয়া হয় এবং চাঁদকে কেন্দ্র করে উৎসব অনুষ্ঠানের দিন ঠিক করা হয়।

বাংলার সামাজিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করে জানা যায় বাংলার অধিকাংশ মুসলমান বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। মহাযানি বৌদ্ধদের ইস্টদেবতা বজ্র। সর্বক্ষেত্রে প্রধান দেবতা বজ্রকে ত্রাণকর্তা রূপে কল্পনা করা হয়। অতীতে সুন্দরবন অঞ্চলের বন জঙ্গলের আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বিপদ থেকে রক্ষা পেতে ‘বজ্র’ ছিল প্রেরণা শক্তি। বৌদ্ধগণ পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও জীবন জীবিকার পরিবর্তন করেননি। সে কারণে জল ও জঙ্গলের বিপদের আশঙ্কা তাঁদের তাড়া করত। অথচ বজ্র দেবতার নাম উচ্চারণ করা ধর্মীয় বাধা হিসেবে আসে। এইরূপ পরিস্থিতিতে বজ্রদেবতা বজ্র বা বদরপির বা বাজপির হয়েছেন। মাঝি-জেলে-মৌলে প্রভৃতি পেশার মানুষ জল জঙ্গলে বদরপিরের নামে মহাযানি বৌদ্ধদের বজ্রদেবতারই স্মরণ করেন।^{২৪} ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যায় পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনায় বদর সাহেব^{২৫} এর মাজার আছে। এখানে ফুল ফল, মাটির ঘোড়া দিয়ে হিন্দু মুসলমান মিলিতভাবে মাজারে হাজত দেয়। বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী তারা প্রতি বছর আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি তিথিতে বদর পূজা করে থাকে। তাদের ধারণা দেবতা রুগ্ন বা রাগান্বিত হলে নৌকা ডুবে যায়। তাই দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য এই পূজা করা হয়ে থাকে।^{২৬}

হুগলি জেলার আরামবাগ থানার অন্তর্গত প্রতাপনগর গ্রামে বদর পিরের আস্তানা রয়েছে। এখানেও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলে মানত করে, শিরনি দান করে। বদরপির উপলক্ষে ১লা মাঘ বড়ো মেলা বসে, যা বদরের মেলা নামে খ্যাত।^{২৭}

পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তর্গত কালনার ১৪ নং ওয়ার্ডের শ্যামকুঞ্জতলার বদরতলায় বদরপিরের নজরগাহ রয়েছে। হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ এই বদর পিরের দরগাহে হাজত-মানত শিরনি দান করেন। অনেকে ছোট মাটির ঘোড়া ফুল ফল মিষ্টি মানত হিসাবে দেন।^{২৮} প্রতি শুক্রবার সেবায়ত কাশেম ও তাঁর ভাই বা পরিবারের কেহ খাদিম হিসাবে দিনের বেলায় হাজত-মানত-শিরনি দেন। মঙ্গল ও শনিবারে হিন্দু ভক্তগণ চিড়া-মুড়ি দরগাহে উৎসর্গ করে। বর্ধমান জেলার দাঁইহাটেও বদর পিরের স্মৃতির মাজার আছে।

এইভাবে আমাদের সচেতনতার অগোচরে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাম বাংলার লৌকিক পির দেবতাদের উৎসব ও মেলাগুলি যে সম্প্রীতির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে সমাজিক দিক দিয়ে তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। লৌকিক

দেবদেবীকে উপলক্ষ্য করে এবং লৌকিক উৎসবের কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাও একত্রিত হবার সুযোগ লাভ করে। পারস্পরিক সংশয়, সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের বিষ বাষ্প হারিয়ে যায়। আসলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষেরই ইহজগতের প্রয়োজন এক। সেই প্রয়োজনের কারণে শেষ পর্যন্ত সব মানুষ একত্রে মিলিত হবার প্রেরণা লাভ করে। তাছাড়া সব মানুষের আন্তর ধর্ম যেহেতু এক, সেই অভ্যন্তরীণ ঐক্যও সকলকে একত্রিত হবার প্রেরণা দেয়। পিরকেও উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন। খজখজের, বদর পির, মানিক পির প্রভৃতি লৌকিক পিরের বর্ণনায় কল্পনা ও বাস্তবতার সংমিশ্রণে সম্পূর্ণ না হলেও প্রায় অনেকাংশেই এরা বাঙালি হিন্দু মুসলমানের মনে জায়গা করে নিয়েছে। যার প্রমাণ এখনও আমরা রাঢ় বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পিরের মেলা ও অনুষ্ঠান লক্ষ্য করতে পারি। যেহেতু এগুলি ইসলামে শরিয়তসম্মত নয়, তাই ইসলামি জীবনধারায় বর্তমানে শরিয়তি ভাবধারার প্রভাব ধীরে ধীরে বিস্তারিত হবার ফলে এই সমস্ত লৌকিক পিরের থান রক্ষণাবেক্ষণের অভাব দেখা দিচ্ছে, পিরের নামে প্রচলিত অনুষ্ঠানগুলি ধীরে ধীরে কমতে কমতে বন্ধ হয়ে যাবার মতো পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। পরিশেষে লৌকিক দেব-দেবী সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার। প্রথমত দেখা যায় লৌকিক দেবদেবীগণ ধীরে ধীরে বিবর্তিত হচ্ছে। অনেক লৌকিক দেবদেবী হারিয়ে যাচ্ছে। অনেক লৌকিক দেবদেবী আবার নিজেদের মধ্যে জায়গা বদল করে নিচ্ছে, তারা মিশে যাচ্ছে অ-লোকায়াত দেবদেবীর সাথে, গড়ে উঠছে হিন্দুর বৃহত্তর পূজা ঐতিহ্য ও সাধনার নতুন নতুন মাধ্যম। সমাজ বদলের সাথে সাথে ব্রাহ্মণ্য সমাজও ধীরে ধীরে এঁদের গ্রহণ করে নিতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু এ ফাঁকে ব্রাহ্মণ মন্দির নিয়েছে দখল করে। মন্দিরে মন্দিরে দেব-দেবী পূজার অধিকার এখন একমাত্র ব্রাহ্মণদের। পাশাপাশি মুসলিম সমাজের শরিয়তি চোখরাঙানির ফলে পিরস্থানের ও মাজারের গুরুত্ব কমতে শুরু করেছে।

Reference:

১. কামিল্যা, মিহির চৌধুরী, আঞ্চলিক দেবতা লোক সংস্কৃতি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০২, পৃ. ১৪-১৫
২. তদেব, পৃ. ১৫
৩. তদেব, পৃ. ১৪-১৫
৪. সরকার, প্রণব (সম্পা.), স্বদেশচর্চা লোক, বাংলার লৌকিক দেবদেবী, সোনারপুর, কলকাতা, লোক প্রকাশনী, ১৭বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ১৩৮
৫. R. M. Eaton, Sufi Folk Literature and the Expansion of Indian Islam, History of Religions 14, No. 2, The University of Chicago Press, Nov 1974, pp. 116-127
৬. চৌধুরী, ড. মোমেন, লোকসংস্কার ও বিবিধ প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৭, পৃ. ২৬-২৭
৭. আহমদ, ওয়াকিল, বাংলার পীর সাহিত্য সংস্কৃতি, বইপত্র প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, আগস্ট ২০১৬, পৃ. ১৫৬
৮. Haq, Muhammad Enamul, A History of Sufism in Bengal, Asiatic Society of Bangladesh, Dacca, 1975, p. 334
৯. নস্কর, দেবব্রত, বাংলার লোকদেবতা ও সমাজ সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯
১০. আহমদ, ওয়াকিল, বাংলার পীর সাহিত্য সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬
১১. দাস, গিরীন্দ্রনাথ, বঙ্গের পির পিরানি কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
১২. L. S. S., O'Malley, Bengal District Gazetteers, Murshidabad, The Bengal Secretariat Book Dept., Calcutta, 1914, pp. 210-211
১৩. দাস, গিরীন্দ্রনাথ, বঙ্গের পির পিরানি কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩
১৪. মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৭৬-২৭৭

১৫. L. S. S., O'Malley, Bengal District Gazetteers, Murshidabad, Op.cit., p. 211
১৬. নিজস্ব ক্ষেত্রসমীক্ষা, দ্রষ্টব্য; ভট্টাচার্য মালিনী ও অন্যান্য (সম্পা.): জেলা লোক সংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ, বর্ধমান, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, জানুয়ারি 2002, পৃ. ২২৭
১৭. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ সংস্করণ, কলকাতা, পৃ. ৪০৮
১৮. ঠাকুর, স্বপনকুমার, রাঢ় কথা মননে সমীক্ষণে, নান্দনিক প্রকাশনী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ৯৬
১৯. নস্কর, দেবব্রত, বাংলার লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২
২০. দাস, গিরীন্দ্রনাথ, বাংলার পীর সাহিত্যের কথা, প্রাগুক্ত
২১. নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষা, দ্রষ্টব্য; দাস, গিরীন্দ্রনাথ: বঙ্গের পির পিরানি কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯
২২. দাস, গিরীন্দ্রনাথ, বঙ্গের পির পিরানি কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯
২৩. আহমদ, ওয়াকিল, বাংলার পীর সাহিত্য সংস্কৃতি, বইপত্র প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, আগস্ট ২০১৬, পৃ. ১৪৯
২৪. নস্কর, দেবব্রত, বাংলার লোকদেবতা ও সমাজ সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯
২৫. Biswas, K. R., West Bengal District Gazetteers, Bardhaman, Education Department, Govt. of West Bengal, Calcutta, 1994, p. 588
২৬. কুণ্ডু, বিশ্বনাথ, বদর পূজা, ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পা.): বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অর্পণ বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৩১৮-৩২৯
২৭. নিজস্ব ক্ষেত্র সমীক্ষা।
২৮. Peterson, J. C. K., Bengal District Gazetteers, Burdwan, Bengal Secretariat Book Dept., Calcutta, 1910, p. 198

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও সাক্ষাৎকার :

- আলম হক, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।
- সৈয়দ আতাউর রহমান, বড় পলাশন, মেমারি, পূর্ব বর্ধমান।
- আইয়ুব হোসেন, রাজোয়া, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান।
- উজ্জ্বল মন্ডল, পানুহাট, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান।
- শীর্ষেন্দু রায়, শ্রীখন্ড, মঙ্গলকোট, পূর্ব বর্ধমান উত্তরপাড়া, হুগলি
- আনিসুর রহমান, আমডাঙা, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান।
- আজিজুল সেখ ও অসীম মিদ্যা, প্রতাপনগর, আরামবাগ, হুগলি।
- শ্যামল দাস, ১৪ নম্বর ওয়ার্ড, কালনা, পূর্ব বর্ধমান।
- সেবায়ত কাশেম, কালনা, পূর্ব বর্ধমান।